তারিখ 9-JUL-2008
পৃষ্ঠা - ১৬ কলাম - ৭

যায়যায়দিন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে অবহেলা

দুর্নীতির কারণে চরফ্যাশন ফাতেমা মতিন মহিলা কলেজ ধ্বংসের পথে

যাযাদি রিপোর্ট

দীর্ঘদিনের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আর দুর্নীতির কারণে ভোলার চরফ্যাশন ফাতেমা মতিন মহিলা কলেজ ধ্বংসের মুখে।

দুর্নীতি আর অনিয়মের কারণে পাঁচবার পাঁচটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি, তদন্ত রিপোর্টও দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যথাযথ দায়িত্ব পালনে অবহেলার কথা জানা গেছে। এ কলেজে ২০০৩-০৬ পর্যন্ত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশনে বারবার দলিলপত্রসহ আবেদন করার পরও কার্যকর কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি। অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতিবাজদের ব্যাপারে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তাই এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের বিরাজমান সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। এ কারণে সুধী মহলের মধ্যে এ এলাকার নারী শিক্ষার সম্ভাবনাময় এ কলেজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর এ কলেজটি ধীরে ধীরে শিক্ষা-দীক্ষায় সুনাম অর্জন করতে থাকে। তবে এক পর্যায়ে এ কলেজটিতে ২০০১ সালের দিকে দুর্নীতি বাসা বাঁধে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালে শিক্ষা বোর্ড এ কলেজের এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়েছে। এ কারণে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

এ কলেজের অবৈতনিক প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইংলিশ নিউজ কাস্টার দিলরুবা হায়দার। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, পিছিয়ে পড়া এ এলাকার নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে তার শ্বশুর আবদুল মতিন মিয়া এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল মতিনের ছেলে প১৫››ক৪

দুর্নীতির কারণে চরফ্যাশন ফাতেমা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ অ্যাডভোকেট মাইনউদ্দিন আহমেদ জাহাঙ্গীরসহ পুরো পরিবার কলেজের জন্য শ্রম, মেধা ও অর্থ জোগান দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের আন্তরিকতা ও সুযোগ্য পরিচালনায় ২০০১ সালে এ কলেজটি ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয়। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এলাকার সরকারদলীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নাজিমউদ্দিন আলম এ কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি হন। প্রথমেই প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল দিলরুবা হায়দার কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। এরপর প্রভাবশালীদের বিভিন্ন চাপে প্রতিষ্ঠাতা দাতা সদস্য মাইনউদ্দিন জাহাঙ্গীর কলেজ ছাড়েন।

সাবেক সংসদ সদস্যের প্রশ্রয়ে রসুলপুর কলেজের অধ্যক্ষ দিল মোহাম্মদ ফারুখ এ কলেজে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান ২০০৩ সালের ৫ মে। তবে এ নিয়োগ বৈধ ছিল না। এ নিয়োগে সহায়তা করেন নাজিমউদ্দিন আলম কলেজের অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস ও ফাতেমা মতিন মহিলা কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নুরুল ইসলাম। জানা গেছে, ডি এম ফারুখের বিরুদ্ধে গোপনে ২০০৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত রসুলপুর কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবেও বেতন-ভাতা তোলার অভিযোগ রয়েছে। আরো অভিযোগ আছে, এ কলেজে নিয়োগের পর পরই প্রভাবশালীদের ইঙ্গিতে ৩৫ জন প্রভাষক নিয়োগের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা হাতানো হয়।

সাবেক সংসদ সদস্যের পৃষ্ঠপোষকতায় কলেজে এককভাবে নিয়োগ বাণিজ্য ছাড়াও সরকারি অর্থ লুটপাটেরও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ দিয়ে তারা সব তদন্ত কাজ বন্ধ রাখার কথা শোনা গেছে। ২০০৭ সালের এপ্রিলে এ কলেজের দুই শিক্ষকের দুর্নীতি ও কমিটির বিভিন্ন অনিয়ম ধরা পড়ে। কিন্তু বিধি অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এসব দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে কলেজের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিবেশের ওপর। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও হতাশা দেখা দিয়েছে।

এখন জানা যাচ্ছে, এ কলেজটি ডোবানোর পেছনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি অসাধু মহলেরও ইন্ধন রয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন- তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয় ও মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে এতোদিনেও এ কলেজের ব্যাপারে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি কেন? এদিকে গোপনে কলেজের পূর্ণাঙ্গ অধ্যক্ষ হিসেবে দিল মোহাম্মদ ফারুখকে নিয়োগ দেয়ার উদ্দেশ্যে গোপনে স্থানীয় পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি আইন হলো, কলেজের যে কোনো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অবশ্যই জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সেই বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারাও নানা ধরনের কথা বলে সময় পার করছেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেছেন, সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া তার কিছু করার নেই। এ রকম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের অবহেলা ও বিরাগভাজনে ভোলার চরফ্যাশন ফাতেমা মতিন মহিলা কলেজ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে।